International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.73-86
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.73-86

ইতিহাস ও মৌখিক ঐতিহ্য: প্রসঙ্গ প্রত্নভাণ্ডার ভরতপুর

সার্থক লাহা

অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, ভারত

Abstract:

Various examples of ruins of ancient civilizations have been discovered and are equally still found in different parts of India. The discovery of various ancient (archaeological) remains has served as a major aid in the reconstruction of history and stimulated the study of early India. Oral tradition is the medium through which various narratives and recollections regarding any artefacts are transmitted in a society. The present article attempts to trace the history, archaeological remains, and oral tradition of such a remarkable archive. Archaeological excavations have found traces of an archaeological site at Bharatpur, east of Shilampur, in the Budbud police station of Durgapur sub-division. The archaeological treasure discovered at Bharatpur is mentioned as 'Tulakshetra Bardhaman Stupa' in the preserved puthi of Cambridge University. As a result of excavations at Bharatpur led to the discovery of Buddhist stupas and Buddha statues. The supa was originally a symbol of Lord Buddha, and later Buddha images emerged. The Hinayanis worshipped Buddha through stupas; the Mahayanis worshipped Buddha directly. Therefore, the importance of Bharatpur Stupa is very significant in the development of Buddhism. At the same time, there are various stories and histories are still prevalent in the mouths of rural people about Bharatpur, which help to write other historical narratives.

Key Words: Archaeology, Oral Tradition, Bharatpur, Buddhism, Stupa.

উপক্রমণিকা: বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের আবিষ্কার ইতিহাসের পুনর্গঠনে একটি প্রধান সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে এবং প্রাচীন ভারতের অধ্যয়নকে উদ্দীপিত করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে দুর্গাপুর মহকুমার বুদবুদ থানার শিলামপুরের পূর্বে অবস্থিত ভরতপুরে এক প্রত্নক্ষেত্রের নিদর্শন মিলেছে। ভরতপুরের আবিষ্কৃত হওয়া প্রত্নভান্ডারটিকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত পুঁথিতে 'তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে [1]ভরতপুর খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধস্তূপ এবং একইসঙ্গে বুদ্ধমূর্তি। স্তূপ ছিল আদিতে ভগবান বুদ্ধের প্রতীক এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধমূর্তির উদ্ভব হয়। স্তূপের মাধ্যমে বুদ্ধপূজা করতেন হীনযানীরা, বুদ্ধমূর্তির সরাসরি পূজা করতেন মহাযানীরা।[2] হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ বিভাগের একইসাথে একস্থানে প্রাপ্ত নিদর্শন সত্যি বিরল।

ভরতপুরের এই বৌদ্ধ স্তূপ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি যদি আমরা আলোকপাত করতে চায়, সেই কাজ বেশ সমস্যাসঙ্কুল। কেননা রাঢ় বাংলার আবিষ্কৃত এই স্তূপটি নিয়ে গবেষণামূলক বিবরন নিতান্তই স্বল্প। 'Indian Archaeology 1971-72- A Review'[3] এই প্রত্ন প্রকাশনায় ১৯৭০ এর পরবর্তীতে ভরতপুরের

খননকার্যের যে বিবরন তা গুটিকতক চরনেই সীমায়িত। পরবর্তী সময়ে A.S.I এর 'Indian Archaeology 1972-73' রিভিউতে ১৯৭২-৭৩ সালে স্তূপটির খননের ফলে প্রাপ্ত যে সামাজিক স্তর সেগুলির বর্ণনা আছে । পরবর্তীর A.S.I 1973-74 Reviewতে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত চারটি ঐতিহাসিক পর্বের বিবরন মেলে।[4] 1974-75 Review এই পর্বীকরনের পাশাপাশি খননকার্যের বর্ননা আছে যা আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।[5] ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের এই রিভিউগুলি গবেষণার ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত করে। এই প্রত্ন রিভিউ-এর ওপর ভিত্তি করেই খননকার্যের সাথে জড়িত শৈলেন্দ্র নাথ সেন তাঁর একটি প্রবন্ধ 'A Note on The Excavated Buddhist Stupa at Bharatpur in Burdwan District (West Bengal)'[6]-এ ভরতপুর সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রত্নরাজি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নশালা ও চিত্রবীথি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রঙ্গনকান্তি জানা তাঁর 'Tracing the Archaeology of Buddhism in the Early Medieval Bardhaman, West Bengal'[7] বর্ধমান জেলার প্রাচীনত্ব, বৌদ্ধ স্থাপত্য এবং ভরতপুরের যে বৌদ্ধ স্তূপ সে সম্পর্কে লিখেছেন। যদিও ভরতপুর বিষয়ক আলোচনা খুব ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত। তাঁর ওপর একটি প্রবন্ধ 'স্থাপত্য ধারার বর্ধমান জেলা'[8]-তেও ভরতপুর বিষয়ক সীমিত আলোচনা পরিলক্ষিত করতে পারি। বর্ধমান ইতিহাস চর্চাকার সর্বজিৎ যশ তাঁর 'বর্ধমান জেলায় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে'[9] গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত সামগ্রিকভাবে ভরতপুর বৌদ্ধ ঐতিহ্য বিষয়ক বর্নন দিয়েছেন। এই নিবন্ধের সংকল্প ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি স্তূপের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে কী গুরুত্ব তা আলোচনার প্রয়াস গ্রহন করা। নিবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয় হল - পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত রাঢ়বঙ্গের একমাত্র বৌদ্ধ স্তূপটির মধ্যে যে স্তরীকরনের ধারনা, খননকার্য, প্রাপ্ত প্রত্নরাজির বর্ননা এবং প্রত্নভান্ডার হিসাবে ভরতপুরের কী গুরুত্ব তা অনুসন্ধান করা। ভরতপুর স্তূপের মধ্য দিয়ে যে একটি সভ্যতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা তা সম্পর্কে জ্ঞান আহরন করা। বৌদ্ধস্তূপের এর ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক কাল বিভাজন, সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাত, ধর্মীয় বিকাশ, রূপান্তরের ধারা প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হওয়াই এক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পাশাপাশি ভরতপুর প্রত্নভাণ্ডার নিয়ে সাধারন মানুষের কী ধারনা, তাঁদের এই সম্পর্কে কীরূপ জ্ঞান সেই অন্বেষণ এক্ষেত্রে ওপর এক বিচার্য বিষয়। এবং এই কাজের জন্য গ্রামের বিভিন্ন মানুষের বিস্তর ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার মূল পাথেয় হয়ে উঠেছে।

বর্ধমান জেলার ভরতপুর বৌদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র: খননকার্য এবং ক্রমবিকাশের রূপরেখা: আলোচ্য গবেষনাটি যেহেতু বর্ধমান অঞ্চলের একটি বৌদ্ধস্তূপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তাই বর্ধমানের নামকরণ, বর্ধমানের প্রাচীনত্ব, বর্ধমানের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মল্লসারুল প্লেট (ষষ্ঠ শতাব্দী), ইরদা তাম্রশাসন (দশম শতকে), নৈহাটি এবং গোবিন্দপুর দান (দ্বাদশ শতক) বর্ধমানভুক্তির' উল্লেখ আছে।[10] এটি মূলত দামোদর উপত্যকা অঞ্চল সংলগ্ন ছিল সে বর্ণনও মেলে।
বিষ্ণুপুরাণে বর্ধমান জনপদের উল্লেখ প্রাপ্তব্য হয় -

উত্তরম্ যৎ শিলাবত্যাঃ
অজয়স্যচৈব্য দক্ষিনম্
ভাগীরথ্যাঃ পশ্চিমায়াং তু
দ্বারকেশ্বরম্ চ পূর্বাস্যাম্
জনপদং তদ বর্দ্ধমান নাম
রাঢ়ী যত্র সন্ততিঃ।।[11]

অর্থাৎ শিলাবতের উত্তরে, অজয়ের দক্ষিনে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে, দ্বারকেশ্বরের পূর্বে যে জনপদ, যেখানে রাঢ়ীরা বাস করেন তারই নাম বর্দ্ধমান। বর্ধতে ইতি 'বৃধ্+শানচ' ধরে প্রত্যায়ান্ত বর্ধমান; যার অর্থ - যার বৃদ্ধি আছে।[12] অজয় নদের তীরে পাণ্ডুক গ্রামে রাজপোতাডাঙ্গার পান্ডুরাজার ঢিবি খননকার্য বা

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার নিঃসন্দেহে বঙ্গদেশে দু-তিন হাজার বছর আগের প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্ব ভাবনার উপর আলোকপাত করে।[13] দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক একটি তাম্রোপলীয় সভ্যতার বিকাশের ইঙ্গিত দেয় এই আবিষ্কার পাশাপাশি গবেষনার আলোচনার স্থান ভরতপুরের খননকার্য প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দামোদরের তীরে বর্ধমানের অবস্থান হওয়ায় তা সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। দামোদরের তীরেই দুর্গাপুর মহুকুমার ভরতপুর অঞ্চলে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খননকার্যের ফলে একটি বৌদ্ধ স্তূপের নিদর্শন মেলে। কাজেই বর্ধমান অঞ্চল যে একটা পর্বে বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভাবিত ছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। ভরতপুর বৌদ্ধ প্রত্নভাণ্ডারের আলোচনার পূর্বে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বর্ধমানের অন্যান্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারলে আলোচনার ক্ষেত্রটি স্পষ্টরূপে আভাসিত হবে। বর্তমান পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর মহুকুমায় ভরতপুর অঞ্চলে ১৯৭০ এর দশকে খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বৌদ্ধ স্তূপ। ইটের কাঠামো সংলগ্ন সংঘারাম, নকল চৈত্যেরও উপস্থিতি লক্ষণীয় এই বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে। ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তূপটির নিদর্শন বঙ্গের সভ্যতার বিবর্তন, কালানুক্রম, এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের যে ধারা তা বুঝতে সহায়ক। মূলত বর্ধমানের গলসি ব্লকের সন্নিকটে কাঁকসা ব্লকে (বুদবুদথানার) অন্তর্গত দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম ভরতপুর। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত ভরতপুরের ঢিবি খনন করে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।[14] আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি ও স্টক নির্মিত স্তুপ এর ধ্বংসাবশেষ থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখানে নব্যপ্রস্তরযুগ হতে নবম-দশম শতক পর্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল।[15] ভরতপুর-মনোরামপুর অঞ্চল মূলত উঁচুনিচু ঢিবির মতো স্থানে অবস্থিত। ঐতিহাসিকগত ভাবে ভরতপুর গোপুম পরগনার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পুর্বাঞ্চলের অংশ, যা সদগোপ বংশের অন্যতম কেন্দ্র ছিল।[16]

১৯৭১ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পূর্ব শাখা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে দামোদর নদের বাম দিকে ৭ কি.মি. দূরে ভরতপুরে একটি বৌদ্ধ স্তূপের কাঠামো অন্বেষিত করা হয়।[17] এই খনন কার্যের ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিচালক ছিলেন ড. এস. সি রায়। খননকার্যে অন্যান্য যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রী এস কে মুখার্জী, সর্বশ্রী ভি সেন, কে পি গুপ্ত। প্রাথমিক খননকার্যে স্তূপের পাশাপাশি সংলগ্ন একটি মনাস্ট্রি বা সাংঘিক পরিকাঠামোর নজির মেলে এবং একাধিক কুলুঙ্গির দেখা মেলে। কাঠামোর মধ্যে উপবেশনকারী সুন্দর বুদ্ধের ভাস্কর্য প্রকাশিত হয়েছে।[18]

তবে, ১৯৭১ সালের পূর্বেই এই কাঠামোটি নজরে আসে। ১৯৭০ সালে শ্রী ফকির চন্দ্র রায়, ড. সুবোধ মুখার্জি এবং শৈলেন্দ্র নাথ সামন্ত প্রথম ভরতপুরের যে ঢিবি এবং ইটের কাঠামো তার প্রথমে নজরে আসে। পরবর্তীতে তাঁদের উদ্যোগে এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ইস্টার্ন শাখা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নশালা ও চিত্রবীথির উদ্যোগে প্রাথমিক খননকার্য সম্পন্ন হয়, যা পুর্ব ভারতের এক চমৎকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য দেয়।[19]

১৯৭২-৭৩ বর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক রিভিউতে খননকার্যের উল্লেখ মেলে। পূর্ব শাখার এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ড. এস.সি রায়, সর্বশ্রী কে.পি গুপ্ত এবং বিমল ব্যানার্জির উদ্যোগে স্তূপের প্রতিষ্ঠা এবং সাংস্কৃতিক স্তর জানতে পুনরায় খননকার্য সম্পন্ন হয়। ফলত ঢিবিটির পশ্চিম এবং দক্ষিন প্রান্তে ১০*১০ মিটার পরিখার সন্ধান মেলে। এই খননকার্যে স্তূপটির বর্গাকার আকৃতির ওপর ৩৩ টি পুড়ানো ইটের স্তর দেখা যায়। দুরকম আকৃতির ইটের ৩০*৮*৭ সে.মি এবং ৪৮*২১*৬ সে.মি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[20] পরিখাগুলি ক্রমে একদম নিম্নে নিওলিথিক-চ্যালকোলিথিক, লৌহ যুগের সংস্কৃতি লক্ষণীয়। সেরামিক শিল্প এবং প্রাচীন সংস্কৃতির চিত্রিত কৃষ্ণ ও লোহিত মৃৎপাত্র, লোহিতের ওপর কৃষ্ণ মৃৎপাত্র দেখা যায়। এই

মৃৎপাত্রগুলি আকৃতি মূলত মহিসাদল, পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সাথে অভিন্ন। অন্য যে প্রত্নরাজি পাওয়া গেছে তা হল, - হাড়ের তৈরি সামগ্রী, ক্ষুদ্রাশ্মীয় দ্রব্য, নব্যপ্রস্তরীয় উপাদান, বিভিন্ন মূল্যবান পাথর প্রভৃতি। এর পরের যে পর্ব সেখানে আদি-মধ্যযুগীয় মৃৎপাত্র যেমন প্রাপ্তব্য হয়, তেমনি পূর্ববর্তী কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রেরও দেখা মেলে। কিছু টেরাকোটা বস্তু, জপমালা প্রভৃতি বস্তু পাওয়া যায়।[21]

পরবর্তীতে আবার ১৯৭৩-৭৪ সালে বর্ধমান জেলার ভরতপুরে নতুন করে খননকার্য করা হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী এস. সামন্ত এবং ইস্টার্ন শাখার শ্রী এস কে মুখার্জী, সর্বশ্রী এস.কে ঘোষ, কে পি গুপ্তা আবার খননকার্য ধারাবহ করেন।[22] এই পর্বে খননকার্যের ফলে চার-স্তরীয় সাংস্কৃতিক স্তরের খোঁজ মেলে। প্রথম পর্ব যা মূলত নিওলিথিক-চ্যালকোলিথিক অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর-তাম্রপ্রস্তর পর্বের। এই পর্বটি মূলত খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের সময়কালের। এই পর্বে কিছু সাধারন অঙ্কিত মৃৎপাত্রের সন্ধান মেলে। সর্বনিম্নভাগে হরিদ্রাভ মৃত্তিকার উপর ক্ষুদ্রাশ্মীয়-তাম্রাশীয় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুসমূহের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্রিত মসৃণ পাত্র সাধারন কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র, কালোরঙের পাত্রের ওপর লাল রঙের অলংকার মিলেছে যা বীরভানপুর, মহিষাদল, পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে খননকার্যের ফলে প্রাপ্তব্য সাক্ষ্যের সমতুল্য। এই পর্বে বাড়ি নির্মানে মূলত বিনষ্ট উপাদান পোড়ামাটি, খড়ক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছিল। অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে হাড়ের তৈরি হাতিয়ার, শাখাযুক্ত হরিনের শৃঙ্গ, নবাশ্মীয় কুঠার, ক্ষুদ্রাশীয় আয়ুধ, রত্ন প্রস্তর নির্মিত পুঁতি আবিষ্কৃত হলেও কোনো তাম্রনির্মিত দ্রব্য তেমন প্রাপ্তব্য হয়নি। সীমিত খননকার্যের ফলে কোনো গৃহ নির্মানের পরিকল্পনা উদ্ভাসিত হয়নি।[23]

দ্বিতীয় পর্বটি মূলত লৌহ বা আইরন যুগের। প্রথম স্তরের ক্রমবিকাশ এই পর্ব। সেরামিক শিল্প, শক্ত মোটা মৃৎপাত্র এই পর্বে চোখে পড়ে। এই পর্বের উপরের স্তরে নর্দান ব্ল্যাক পলিশড ওয়ার এবং ব্ল্যাক পলিশড ওয়াড়ের নির্দশন আছে। তাম্র-প্রস্তর যুগের পরবর্তী কাল হচ্ছে লৌহযুগ এখানে পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল কিন্তু এই যুগের পোড়ামাটি নিদর্শনগুলি খুবই উন্নত মানের ছিল না, যদিও লৌহ ব্যবহারকারীদের জনবসতি পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে উত্তর ভারতের চিক্কন কৃষ্ণবর্ণের সভ্যতার (culture of North Indian black polish pottery) সংস্পর্শে এসে ছিল তার প্রমাণ সাম্প্রতিক খননে মেলে। এই স্তরে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার মধ্যে মুক্তাঙ্গনে ৫০ সে.মি. ব্যাস বিশিষ্ট একটি উনান। এছাড়া অসংখ্য মসৃণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল টুকরো প্রাপ্তব্য হয়েছে এই পর্বে।[24]

তৃতীয় পর্বটি মূলত গুপ্তকালের। এই পর্বে পাকা ইটের কাঠামো চোখে পড়ে। এই স্তরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বস্তু হল,- ব্যবহৃত ইটগুলি রোদে শুকিয়ে গাঁথা হয়েছিল। এই পর্বটি ছিল পূর্ববর্তী পর্বের সাথে সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি।[25]

চতুর্থ পর্বে পঞ্চরথাকৃতি বর্গক্ষেত্র কাঠামোর জরাজীর্ন স্তূপের নির্দশন মেলে যা মূলত অষ্টম-নবম শতকের। বারবার ব্যবহৃত ইট দিয়ে এই নির্মান সম্পন্ন হয়েছিল। ইটের পরিমাপ ৩০*২৮*৭ সেমি। মনে হয় অন্য কোন ভগ্ন অট্টালিকা থেকে ইট সংগ্রহ করে পুনরায় এই স্তূপে ব্যবহৃত হয়েছিল।[26]

১৯৭৪-৭৫ প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ বিভাগের রিভিউতে উল্লেখ আছে পুনরায় খননকার্যের কথা, যার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতির স্তর বোঝা এবং চিত্রিত কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্রের অধিক সন্ধান। এই পর্বেও চারটি সাংস্কৃতিক স্তরের উল্লেখ মেলে।[27] প্রথম পর্বে যা মূলত পরবর্তী চ্যালকোলিথিক পর্বকে সূচিত করে। বিভিন্ন মৃৎপাত্র, তাম্র বস্তু, ক্ষুদ্র পাথরের দ্রব্যাদি, ক্ষুদ্রাশ্মীয় যন্ত্রপাতি, হাড়ের তৈরি জিনিস, কৌলাল সন্ধান মেলে। পাশপাশি দুটি চুল্লির নিদর্শন মেলে।দ্বিতীয় পর্ব যা পূর্ববর্তী পর্বের ধারাবহ, এই স্তরে লৌহ সামগি প্রাপ্তব্য হয়। এই স্তরের পড়ে বহুকাল স্থানটি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। তৃতীয় পর্বটি স্বতন্ত্র কেননা পক্ক ইটের

কাঠামো প্রাপ্তব্য হয়। ক্ষুদ্র সময়ে সীমায়িত এই পর্বটির নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কে প্রত্ন রিভিউ নির্বাক। চতুর্থ পর্বে স্তূপ নির্মানের মধ্যবর্তী যে বিচ্যুতি তার সাক্ষ্য বহন করে।[28]

সম্প্রতি আবার নতুন করে খননকার্য শুরু হয়েছে ভারতীর প্রত্নতত্ত্বের কলকাতা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্নবিদ শুভ মজুমদারের নেতৃত্বে। নতুন করে উৎখনন শুরু হয় ২০২৩ জানুয়ারি মাসে যা মূলত ১৫ই মার্চ পর্যন্ত চলে। এই পর্বের খননকার্যে তাম্রাশীয় যুগের লাল-কালো পাত্র ছাড়াও নানা মৃৎপাত্রের অবশেষ মিলেছে। স্তূপের পাশাপাশি নকল চৈত্য এবং সংলগ্ন সংঘারামের উপস্থিতি উদ্ভাসিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই শুভ মজুমদার বলেছেন, “The site lay unexcavated for almost fifty years. We were looking at the cultural sequence of the stupa from where black and red ware pottery belonging to the Chalcolithic Age was also recovered. A Buddhist stupa cannot exist in isolation, and the recent excavations have revealed the presence of an extended monastery complex”[29] এবারের খননকার্যে স্তূপ সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি কক্ষের নিদর্শন মিলেছে। শুভ মজুমদার বলেছেন, “এখনও পর্যন্ত কক্ষটির দেওয়ালে পরপর ষোলোটি ইটের স্তর পাওয়া গিয়েছে। এই দেওয়ালটি সম্ভবত কক্ষটির একেবারে নীচের অংশ। সে ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ঘরই ছিল বলে অনুমান করা জেতে পারে”। তিনি আরও জানান, “আমরা আরও খনন করে কক্ষটি সম্পূর্ণ বার করে আনতে চাই। পাশাপাশি কয়েকটি ঘর ছিল কি না, তা-ও সন্ধান করতে হবে”।[30] যদিও মার্চ মাসে খননকার্য বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শুভ মজুমদারের দায়িত্বের স্থানান্তর এক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভরতপুর বিশয়ক কী ভাগ্য রচনা করবে তার জন্য আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।

আমরা এই আলোচনায় ভরতপুরে খননকার্যের সূচনা, প্রক্রিয়া, এবং স্তরীকরণ বা ক্রমবিকাশের যে ধারা সে সম্পর্কে অবগত হতে পারি। এই সাধারন আলোচনা নির্দিষ্ট করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে ভরতপুরের কী গুরত্ব তা আমরা পরের অধ্যায়ে চর্চা করব। যেখানে বাংলার বৌদ্ধ স্তূপ হিসাবে ভরতপুরের কি গুরুত্ব, প্রাপ্ত্য বৌদ্ধ মুর্তির এবং অন্যান্য প্রত্নরাজির বর্ননের চেষ্টা করা হবে।

বৌদ্ধ প্রত্নভান্ডার ভরতপুরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব: বর্ধমানে আবিষ্কৃত দুর্গাপুর মহুকুমার অন্তর্গত বৌদ্ধ স্তূপটি পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত একমাত্র বৌদ্ধ স্তূপ। তাই স্বভাবতই এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিদ্যমান। প্রাপ্তব্য প্রত্নরাজির গুরুত্বও অনেক কারণ তা একটি অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। ভরতপুরের খননকার্যে একইসঙ্গে বৌদ্ধ স্তূপ এবং বুদ্ধমূর্তির আবিষ্কার বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান এবং হীনযান দুটি শাখার এক স্থানে উপস্থিতি স্বততই প্রত্নভাণ্ডার হিসাবে যেমন গুরুত্বপুর্ন তেমনি বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তন বুঝতেও অন্যতম মাধ্যম এই অধ্যয়ন। স্তূপের মাধ্যমে বুদ্ধপূজা করতেন হীনযানিরা, আর বুদ্ধমূর্তির সরাসরি পুজো করতেন মহাযানীরা। প্রাপ্ত তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বুদ্ধ মূর্তির উদ্ভব হয়েছিল। ভরতপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এই ধারনার সৃষ্টি করে যে, মহাযানীরা বুদ্ধ মূর্তির প্রত্যক্ষ উপাসক হলেও পূর্ববর্তীকালের বুদ্ধের পবিত্র স্তূপ একেবারে বর্জন করেননি।[31] কারণ, বুদ্ধের দেহাবশেষ সুরক্ষিত করে যে স্তূপ নির্মান করা হত তার প্রাসঙ্গিকতা কখনও হারিয়ে যায়নি। চৈনিক বৌদ্ধ পর্যটকের দৃষ্টিতে হীনযান ও মহাযান মতবাদ ছিল পরস্পরের পূরক, কাউকে বাদ দেওয়া যায়না।

বৌদ্ধ স্তূপের খননকার্যের তৃতীয় স্তরের পরবর্তী কয়েক শতবর্ষ পরে এখানে যে নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে তা গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে পাল যুগ পর্যন্ত চলে আসে, এই যুগ ইতিহাসের স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশে ছিল সুবর্ণ যুগ।[32] এই সময়েই তাম্রাশীয় যুগের একটি স্তূপ নির্মিত হয়। স্তূপটি নির্মিত হয় ১২*৭০ ও ১২*৬৫ বর্গ সেন্টিমিটার বিশিষ্ট, একটি সুন্দর কারুকার্যে ভরা নিকটবর্তী প্রাচীন মন্দিরে এবং বিহারের

ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ভুগর্ভে নির্মিত ৩৩ টি সোপান সম্বলিত স্তূপটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। স্তূপের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং তা প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমান পাথর কুচি ও ঘুটিং নির্মিত কাদা মাটির মসলার ঢালাই।[33] পঞ্চকোণ বিশিষ্ট স্তূপের উপরের গায়ে স্থানে স্থানে পোড়ামাটির কাজ করা নকল চৈত্যে ভর্তি। এরই গায়ে অনেক কুলুঙ্গি আছে। কুলুঙ্গিতে পাথরকুচি কাদামাটির বিশিষ্ট স্থানে স্থানে পোড়ামাটির কাজ করানো বজ্রাসন আসনবিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন তথাগত বুদ্ধ মূর্তি।[34] প্রত্যেকটি বৌদ্ধ মূর্তি মূলত বেলেপাথরের দ্বারা সুসজ্জিত। প্রত্যেক মূর্তি বোধি (অশ্বত্থ) বৃক্ষের সম্মুখে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বজ্রাসন এবং ভূমিস্পর্শমুদ্রা এভাবে উপবসনরত। বর্ননাপ্রসঙ্গে Benjamin Rowland তাঁর ‘The Art and Architecture’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘The eyes are half-closed, the cheeks round and full, the mouth ample with lips drawn into a slight smile’[35] R.C Majumdar আরও যোগ করেছেন তাঁর ‘History of Bengal’ গ্রন্থে, তিনি বলেছেন, ‘the mild calmness on every face is accentuated by half-closed eyes invariably looking downwards’ ।[36]

আবিষ্কৃত ভাণ্ডারের এর নির্মাণকাল সম্ভবত খ্রিস্টীয় নবম থেকে দশম শতাব্দী। এটি বাংলার আবিষ্কৃত প্রথম বৌদ্ধ স্তূপ। ভরতপুরে তাম্রাশ্মীয় যুগের সময়কালে পঞ্চরথের ওপর ইটের গাঁথুনি দিয়ে একটি স্তূপ নির্মিত হয়। বর্ধমান জেলার দামোদরের তীরে অবস্থিত ভরতপুরের তাম্রাশ্মীয় যুগ যে খ্রিস্তপূর্ব দ্বিসহস্রকের মধ্যভাগে অতিবাহিত হয়েছে, তা সাম্প্রতিককালে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়েছে রেডিও-কার্বন পরিক্ষার দ্বারা।[37] পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, ভরতপুরের ঢিবিতে উৎখননের ফলে যে সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে তা পান্ডুরাজার ঢিবির সমপর্যায়ভুক্ত এবং ভরতপুরের অদূরে দামোদরের ২ কি.মি. দক্ষিনে বাঁকুড়ার পোখরানার আবিষ্কৃত হয়েছে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার অপর একটি প্রত্নক্ষেত্র।[38] প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখা ভালো যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে রক্ষিত খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের একটা বৌদ্ধ পুঁথি (অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা) -তে ‘তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তুপ’-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চলে ভরতপুরের উৎখনন করা স্তূপটি ব্যতীত আর কোনো স্তূপের প্রত্নচিহ্ন এখনও পাওয়া যায়নি। পুঁথিতে উল্লেখ আর প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিষ্কার একই কিনা তা পর্যাপ্ত তথ্যের আলোকে অনুসন্ধান যোগ্য। তবে, শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত লিখেছেন যে সমগ্র রাঢ় বাংলা আলোচ্য ভরতপুর আবিষ্কৃত স্তূপ ব্যতীত অপর কোন বৌদ্ধ স্তুপ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। যে কারনে আমরা ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তুপকে ‘তুলাক্ষেত্র বর্ধমান স্তূপ’ রূপে অভিহিত করতে পারি।[39] স্তূপটি সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে মালদহ জেলায় জগজ্জীবনপুর এর আরেকটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তবে তা বর্ধমান জেলায় মোটেই নয় সে দিক থেকে তুলাক্ষেত্র বর্ধমান হিসাবে ভরতপুরের দাবি এখনো নস্যাৎ করার মতো যুক্তি নেই।[40] অপর একটি বৌদ্ধ পুঁথি থেকে জানতে পারা যায় ইৎ-শিং এর সমকালীন একটি ধর্মরাজিকা চৈত্য রাঢ় অঞ্চলে (বর্ধমানে) স্থাপিত হয়েছিল।[41]

ভরতপুরে প্রাপ্ত প্রত্নরাজি তথা, মৃৎপাত্র, হাড়ের তৈরি হাতিয়ার, শাখাযুক্ত হরিনের শৃঙ্গ, নবাশ্মীয় কুঠার, ক্ষুদ্রাশীয় আয়ুধ, রত্ন প্রস্তর নির্মিত পুঁতি থেকে অনুমান করা যায় যে ওই সময়কার মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকার্য পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার। অধিবাসীর পাথর অনুশীলন অস্ত্রশস্ত্র তামা ও জীবজন্তুর হাড়ের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। অনুমান ভারতের ভরতপুরের প্রাচীন এই জনবসতির সাথে দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী বীরভানপুর এর যাযাবর মানুষের সাথে আত্মার যোগসুত্র ছিল। বীরভানপুর এর যাযাবর মানুষের সঙ্গে বীরভানপুর এর মধ্যবর্তী প্রস্তর যুগের   অধিবাসীরা ভরতপুরের নব্য প্রস্তর যুগের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিল।[42] উভয়ের জীবনযাপনপ্রণালি মোটামুটি একই রকম ছিল ভরতপুর এ আবিষ্কৃত নকশাকাটা মৃৎপাত্র ও মহিষাদল (কোপাই নদী উপত্যকা) অঞ্চলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র প্রায় সমগোত্রীয় ভরতপুর থেকে আরো জানা যায় যে এই সময়কার অধিবাসীরা মাটির ঘরে বাস করত।[43] মুক্ত প্রাঙ্গণে বড় বড় উনানে (হয়তো কয়েকটি

পরিবার একসঙ্গে বা যৌথভাবে রান্নার কাজ করত, যেমন পাঞ্জাবের হরিয়ানার কাছে যৌথ উনান 'সাঁঝ-চুল্লা) খ্রীস্টপূর্ব দু হাজার বছর আগের সভ্যতার সঙ্গে ভরতপুরের আবিষ্কৃত সভ্যতার একটি মিল দেখা যায়।[44] স্তূপের ওপরের অংশটি যথাক্রমে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে বলে এটিকে 'পঞ্চরথাকৃতি স্থাপত্য' বলা হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে, এই স্তূপটির স্থাপত্য কৌশল ওড়িষ্যার রত্নগিরি স্তূপের অনুরূপ।[45] ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমান গেজেটিয়ারে ডঃ শৈলেন সামন্ত মন্তব্য করেন, 'নির্মান শৈলী এবং প্রাচীনত্বের দিকে স্তূপটি যে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় নির্মিত সপ্তম থেকে নবম শতকে তা স্বীকৃত'।[46]

ভরতপুর থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং প্রত্নরাজি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্যের মতোই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বৌদ্ধ নির্মানের কাঠামোর পাশাপাশি একটি স্থানে সংস্কৃতির যে বিবর্তন তা আমরা বুঝতে পারি। কালের স্রোতে সংস্কৃতির আবর্ত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। প্রত্নরাজি থেকে আমরা অর্থনৈতিক বিবর্তন যেমন বুঝতে পারি তেমনি সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতাও পরিলক্ষিত হয়। একইসাথে বৌদ্ধ স্তূপ এবং মূর্তির প্রাপ্তব্য বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপান্তর তা সম্পর্কে জ্ঞান আহরনে সাহায্য করে। পাশাপাশি মৃৎপাত্রের সাক্ষ্য, ব্যবহৃত ইটের ব্যবহার স্তূপটিতে তৎকালীন সভ্যতার পরিচায়ক। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিবর্তনের স্বরূপ উদঘাটন করে অগ্রগতির সাথে সাথে অবনতির ধারাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে। কালস্রোতে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার সাহিত্যিক উপাদানের তুলনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস্যাদির তাৎপর্য যে অধিক তা প্রমানে সমর্থ বর্ধমানের ভরতপুর স্তূপটি। স্তূপটির মধ্যে বৌদ্ধ মূর্তির শৈলী ও অভিব্যক্তি তা সৃজনশীলতার পরিচায়ক। বর্ধমান অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিবর্তন এবং নানা স্বকীয়তার অমূল্য স্মারক ভরতপুরের এই বৌদ্ধ স্তূপটি।

ভরতপুর প্রত্নভাণ্ডার এবং মৌখিক ঐতিহ্য: লোককাহিনী মূলত মৌখিক ঐতিহ্য, যা সাবলীল ধারায় মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। অনেক সময় কালের গণ্ডী অতিক্রম করে অগ্রবর্তী হয়। লোককাহিনীর বিস্তৃতির মূল কারণ এটি মূলত অসাম্প্রদায়িক। বিশেষ কোন ধর্ম বা সমাজের বা স্থানের মধ্যে এগুলি সীমায়িত থাকে না। লোকগল্পের নায়কের কিছুক্ষেত্রে নাম থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাম থাকে না। যেমন, এক যে ছিল রাজা অথবা এক যে ছিল রানি অথবা এক যে ছিল ডাকাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শুরু হয় গল্পের প্রাথমিক পর্ব। লোককাহিনী কালের সীমা অতিক্রম করে মূলত একই বিশ্বাস নিয়ে জীবন্ত থাকে। ভরতপুরের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে একটি লোকগল্প উঠে আসে স্তূপ তথা প্রত্নভান্ডারটি নিয়ে। তা হল - এক যে ছিল রাজা, তাঁর নাম ভরত, সে খুব অত্যাচারী ছিল, তাঁর আমলে সাধারন মানুষ বেশ কষ্ট আর অত্যাচার নিয়ে জীবনধারন করত। একদিন সবাই এই অত্যাচারী রাজাকে মেরে ফেলে তাঁর প্রাসাদের নীচে পুঁতে দেয়। এবং খননকার্যে প্রাপ্ত স্তূপটি আসলে স্তূপই নয়, এটি রাজার বাড়ি। আর ভরত বলে এক রাজা ছিল বলেই গ্রামের নাম ভরতপুর হয়েছে।[47] মূলত এই একই মৌখিক গল্প আজও ভরতপুর সহ পাশ্ববর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দাদেরও মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। নিম্নে সাক্ষাৎকারে তাঁদের ভরতপুর বিষয়ক কি মত, সেটি তুলে ধরা হল, -

বর্তমান খননকার্যের (২০২৩, জানুয়ারি-মার্চ) সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক তথা ভরতপুর গ্রামের বাসিন্দা ৩৪ বছর বয়সী রামপ্রসাদ পাল জানান, "এইটি মূলত ভরত রাজার বাড়ি। ভিতরে হয়তো বাড়ি আছে, ঘর আছে। আমরাও ছোটবেলায় খেলা করেছি। বাঁধানো জায়গায় উঠেছি, ব্যাট-বল সহ অনেক খেলা করেছি। তাঁকে এ বিষয়ে আরও জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, ভরত বলে এক রাজা ছিল, তিনি খুব অত্যাচার করত তাই গ্রামবাসীরা তাঁকে এখানেই মেরে পুঁতে দেন। সেই থেকেই নাম ভরতপুর"।[48] খননকার্যে যুক্ত এবং নবম পাশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও মানতে নারাজ যে এটি একটি বৌদ্ধ স্তূপ, যা সাধারনের প্রত্নভাণ্ডার এবং

ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক। ওপর এক শ্রমিক কৈলাস মেটে একই সুরে এটিকে ভরত রাজার বাড়ি বলেই পরিচয় দেন।[49]

পার্শ্ববর্তী নস্করবাঁধ গ্রামের ৬০ বছর বয়স্ক বুদ্ধদেব রুইদাস তাঁর এ বিষয়ে ধারণা কী জিজ্ঞেস করতে জানান, "ছোট থেকে দেখছি ভরত রাজা বাড়ি এটা এবং সরকার থেকে লোক এসে মাটি খুঁড়ে বন্ধ করে দিয়েছে জায়গাটা। ভিতরে বাড়ি আছে, পাশে একটা পুকুর আছে আর পুকুর দিয়ে সুরঙ্গ আছে বলে মনে করছেন। তিনি জানান খননকার্যে ৫ কেজি ওজনের সোনা ব্যাঙ পাওয়া গিয়েছিল। এবং যিনি প্রথম মাটি খোঁড়েন তিনি মারা গিয়েছিলেন খননের কিছুদিনের মধ্যেই। কী কারনে মারা গেলেন জিজ্ঞেস করতে বলতে বলেন, তাঁর মতে মাটি ঘোরার জন্যই মারা গেছে তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন এটি রাজারা রাজরার ব্যাপার ধরুন ঠাকুরের গাছটা আছে তাকে না মানা হলে তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে। তিনি জানান বিজ্ঞানীরা আবার খুঁড়ছে, এখানে মূলত রাজার বাড়ি আছেই"।[50]

ভরতপুর সংক্রান্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ স্তূপটি সম্পর্কে ধারনা, খননের পুর্বাবস্থা এবং খননকার্য এবং স্থানীয় গল্পকথা সবচেয়ে প্রকৃষ্টভাবে তুলে ধরেন পার্শ্ববর্তী মনোরমপুর গ্রামের বাসিন্দা (স্তূপের ঠিক পাশেই ইনার বাড়িটি স্থিত) মদন মোহন রায়, যিনি পূর্বে এই অঞ্চলের প্রাক্তন উপ-প্রধান ছিলেন। তিনি লিখিতভাবে এই প্রত্নভান্ডার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি জানান, যা নিম্নে বর্নিত হল- "পূর্ব বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত ভরতপুর মৌজায় ভরতপুর ও মনোরমপুর গ্রামের মাঝখানে মাটির একটি উঁচু স্তূপ ছিল। পুর্বপুরুষ সূত্রে আমরা শুনে আসছি এই স্তূপটি ভরত রাজার আবার কেও কেউ কেউ বলতেন 'বড়-ডাঙার ঢিপি'। জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরে মৃত গবাদি পশু ফেলার (গো-ভাগাড়) স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঠিক তার পাশেই আম ও তেতুল গাছের বাগান ছিল যা তালগাছ তারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাতে অজস্র শকুন বসবাস করত। সাধারণ মানুষের এই স্থানে যাতায়াত ছিল না, শিশুরাও ভয় পেত। প্রবাদ ছিল ওই ঢিপির নিচে গুপ্তধন আছ। ঢিপির আশে-পাশে ছড়িয়ে থাকা টুকরো ইট কাঁচা রাস্তার উপর দেওয়ার সময় আচমকাই একটি দেওয়াল চোখে পড়ে। গুপ্তধনের আশায় স্থানীয় মানুষেরা খনন করতে শুরু করলে খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে বুদবুদ থানা ও 'বসুমতি' খবরের কাগজের সৌজন্যে খবরটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯৭১-৭২ সালে খননকার্য শুরু হয়। বছর তিনেক খননকার্যের চেষ্টায় একটি আস্ত ভাগাড় রূপ পায় 'বৌদ্ধ স্তূপে'। ঐতিহাসিকদের মতে যা পাল যুগের বা প্রায় ১২০০ বছর আবার কিছুটা অংশ কনিষ্কের আমলের। বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তি এখান থেকে খুঁজে পাওয়া যায় এবং বহু প্রাচীন হাড়ির ভগ্নাবশেষ খোলামকুচির আকারে আবিষ্কৃত হয় যা বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সংরক্ষিত। আধিকারিকদের ধারণা এই ভগ্নাশেষ থেকে একটি প্রাচীন সভ্যতার আভাস পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্তূটির পূর্ব ও উত্তর একটি দিঘী আছে, দক্ষিণে দামোদর নদী প্রবহমান। স্থানীয় মানুষদের ধারণা অনুযায়ী এই দিঘীটি বহু পরে স্থানীয় জমিদার খনন করিয়েছিলেন। ভরতপুর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে কসবা নামে একটি গ্রাম আছে যেখানে চাঁদ সদাগরের বসতি ছিল বলে কথিত আছে। একটি অতি প্রাচীন শিব মন্দির সেখানে আছে। যেখানে চাঁদ সদাগর পুজো করতেন। বর্তমানের এই স্তূপটির আশেপাশে পুনরায় খনন চলছে এবং বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার হয়েছে। মনে করা হচ্ছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে থাকতেন। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা অনুযায়ী আরো বহু কিছু তথ্য এই স্থানটি থেকে আগামী দিনে পাওয়া যেতে পারে। বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে ১৯৬৭ সালে আমার হাতে তোলা একটি ছবি এর সঙ্গে দিলাম (ছবিটি চিত্রাবলীতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে) যেখানে দেখা যাচ্ছে মৃত গবাদিপশুর মাংস খেতে ব্যস্ত শকুনের দল এবং ঠিক তার পাশেই বর্তমান বৌদ্ধস্তূপটি সেই সময়ে সম্পূর্ণ মাটি দ্বারা আবৃত্ত"।[51]

উপসংহার: বর্ধমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত ভরতপুরের এই অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি, বৌদ্ধ প্রভাব এবং কৌশল, ধর্মবিবর্তন, স্থাপত্যের বিবর্তন প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে প্রাচীন সময়কালের দর্পণ হয়ে উঠেছে। প্রত্নভান্ডারটির নিরীক্ষণে আমরা ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তূপের অগ্রগতির ন্যায় অবক্ষয়ের বিষয়টি সম্পর্কেও অবগত হতে পারি। তবে স্তূপটির উচ্চতা, গঠনগত কৌশল সম্পর্কে এবং প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হতে পারি না তার কারণ অসম্পূর্ণ খনন কার্য। একসময় ১৯৭১ সালে স্বল্পপরিমানে খননকার্য হয়। সেই প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহ-অধিকর্তা সুশান্ত মুখোপাধ্যায়। হটাৎ তাঁর মৃত্যুর ফলে এই উৎখনন মাঝপথে গতি হারায়।[52] ইটের যে কাঠামো তা পরবর্তীতে কোষাগার হানাদারের কবলে পড়ে ফলে ধ্বংস সাধন হয়। যদিও ইটের এই স্তুপ কাঠামোটি এখনও সৌন্দর্যের পরিচায়ক। স্তূপের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে আদি-মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ সংঘারামের ধবংস চোখে পড়ে।

স্তূপ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত উঁচু ঢিবি স্থানে অবস্থিত হওয়ায় পরবর্তী খননকার্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই অঞ্চলের অনেক ইতিহাস এখনও অধরাই রয়ে গেছে। 'এইসময়' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে এই পুরাতত্ত্বের ওপর বর্তমানের যে উদাসীনতা তা চোখে পড়ে। পত্রিকায় উল্লেখ আছে, 'ভরতপুর গ্রামে আছে অষ্টম শতাব্দীতে ইটে নির্মিত পঞ্চরথ বৌদ্ধ স্তূপের বেদিকা অংশ। তার আশেপাশে পড়ে আছে ইট ও মৃৎপাত্রের অংশ। অবাধে ছাগল চরে সেখানে। ভরতপুরের বৌদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে স্থানীয় লোকস্মৃতি একেবারে লুপ্ত। যথাযথ উৎখনন করলে প্রাক-তুর্কি বিজয় পর্বের বর্ধমানের বৌদ্ধ অধিকার সম্পর্কে নতুন অধ্যায় যোগ হবে। তবে উপযুক্ত কতৃপক্ষ কেন এ বিষয়ে উদাসিন তা কেও জানেনা'।[53] গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য মন্ডিত ভরতপুর অন্যান্য প্রত্নভাণ্ডারের মতো জনমানসের অপেক্ষাকৃত অসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। তবে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার আনুকূল্যে পুরাতাত্ত্বিক বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে স্তূপটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কাজ শুরু হয়।[54] কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসীরা তখন এই কাজে বাধা দেয় কারণ গ্রামের একটি রাস্তা এই বৌদ্ধ স্তুপ এর ভেতর দিয়ে প্রায় ১০০ মিটার গিয়ে পাকা রাস্তায় উঠেছে। তাদের এই চালু রাস্তা বন্ধ করা যাবে না- এই ছিল গ্রাম বাসীর দাবি, ফলে কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। এই সমস্যা আরও জটিলতা নেয় ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে যখন এই রাস্তাটি তেমনি রামপুর থেকে বৌদ্ধস্তূপ পর্যন্ত একশো দিনের প্রকল্প শুরু হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের 'এনসিয়েন্ট মনুমেন্ট আর্কিওলজিক্যাল সাইটস এন্ড রিমেইন্স অ্যাক্ট' এবং ১৯৫৯ অ্যাক্ট অনুযায়ী এ.এস.আইয়ের যে কোন জমিতে অন্য কোন প্রকল্পের কাজ নিষিদ্ধ তাই পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয় এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এর কর্মী এবং ওই গ্রামের স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিতন্ডা দেখা যায়।[55] প্রত্ন বিভাগ কর্তৃক প্রাচীর নির্মিত হলেও তা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা যায়। শ্রাবনী দত্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' একটি প্রতিবেদনে লেখেন, "১৯৫৮ সালের আইন অনুসারে এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনটি প্রাচীন স্মারক তথা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যাতে কোনোভাবে ক্ষতি না করা হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্তূপকে ঘিরে একটি ভ্রমণকেন্দ্র তৈরির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে ভরতপুর অবহেলিত গ্রাম হিসাবেই এক পাশে পড়ে রয়েছে"।[56] স্তূপের ইট খোলামেলা অবস্থায় পড়ে আছে, ইটের চুরি এবং অঞ্চলে পশুচারন, বাচ্ছাদের খেলার এবং বৈকালে সাধারন মানুষের অবাধে স্তূপের ওপর বসে গল্পগুজবের আসর জমানোর স্থান হয়ে গেছে যা জনমানুষের পুরাকীর্তি সম্পর্কে অসচেতনতার ইঙ্গিত। সাধারনের নানা চিত্র অঙ্কন সভ্যতার পুরনো সভ্যতার সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচায়ক। আধুনিক যন্ত্রায়িত নগরকেন্দ্রিক বিশ্বায়িত সভ্যতায় বিকাশের ধারা চললেও এই প্রাচীন উৎস্যাদির নিজের অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত। এই পুরাকীর্তিগুলো বাঁচিয়ে রাখতে এবং প্রাচীন ইতিহাসের সংরক্ষনে প্রত্নবিভাগের পাশাপাশি সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন আছে। বর্ধমান জেলার এটিই একমাত্র ঐতিহ্য রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। খুশির খবর আবার ২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) নতুন

করে খননকার্য শুরু হয়েছে। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় বর্তমান খননকার্যের মূল সংঘটক শুভ মজুমদার জানান, "The sir lay unexcavated for almost fifty years. We were looking at the cultural sequence of the stupa from where black and red ware pottery belonging to the Chalcolithic Age was also recovered. A Buddhist stupa cannot exist in isolation, and the recent excavations have revealed the presence of an extended monastery complex"।[57] কিন্তু এই খননকার্য মার্চ পর্যন্ত চলে এখন বন্ধ হয়ে রয়েছে, শুভ মজুমদারের কর্মক্ষেত্রের স্থানান্তর হয়েছে। আরও বৃহৎ আকারে খননকার্য করলে হয়তো আরও অনেক অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ঐতিহাসিক আলোকে।

ভরতপুরের এই স্তূপ যা একটি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসের সাক্ষ্য হলেও তা আজও সাধারণ চোখে একটি গুপ্তধনে ঠাসা রাজার বাড়ি ছাড়া কিছুই নয়। পুরাকীর্তির ওপর এই ঔদাসিনতা বাস্তবিকে প্রাচীন উৎস্যাদির ওপর অভিশাপসম। বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যখন আধুনিক যন্ত্রায়িত, বিশ্বায়িত বিশ্বে এই পুরাতত্ত্বের রক্ষণের উদ্যোগ খুব স্বল্প। আমাদেরই এই সব রক্ষনের কাজে প্রয়াসী হতে হবে। ইতিহাসে এরকম পুরা স্থাপত্যকীর্তির ওপর গবেষণা করলে আঞ্চলিক ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, লোকজ্ঞানের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইতিহাস তথা প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি হবে এবং প্রাচীন ইতিহাস আরও প্রাঞ্জল হবে।

চিত্রাবলী:

চিত্র ১ - ১৯৬৭ সালে তোলা ছবি; খননকার্যের পূর্বে

চিত্র ২ - স্তূপের দৃশ্য, দূর থেকে

চিত্র ৩ - ভরতপুর স্তূপ, সম্মুখ দৃশ্য

চিত্র ৪ - স্তূপের মধ্যে কুলুঙ্গি

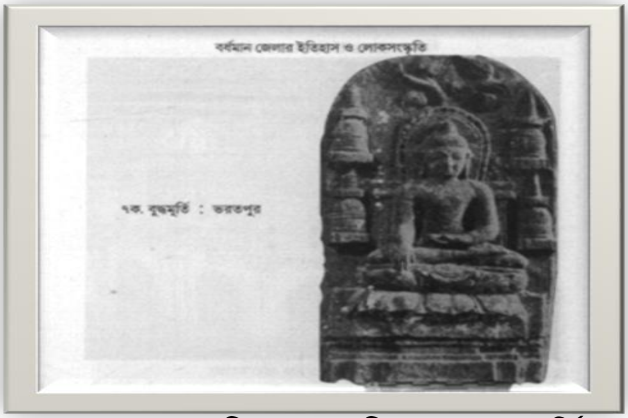

চিত্র ৫ - কুলুঙ্গিতে প্রাপ্ত বুদ্ধ মূর্তি

চিত্র ৬ - ভরতপুরে প্রাপ্ত প্রত্নরাজি

চিত্র ৭ - সাম্প্রতিক খননের চিত্র

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:

1) ড. রূপ কুমার বর্মন (অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) যিনি আমার এই কাজে প্রাথমিক পর্ব থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন।
2) ড. রঙ্গন কান্তি জানা (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রত্নবীথি ও চিত্রশালা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) যিনি অনেক বহুমূল্য চিত্র ও লেখা পাঠান।
3) ড. সর্বজিৎ যশ (বর্ধমান ইতিহাস গবেষক) যিনি তাঁর লেখা 'বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে' বইটি ডাকযোগে পাঠান।
4) ড. প্রসেনজিৎ নস্কর (অতিথি অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) যিনি গবেষণার খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক মতামত প্রদান করেছেন।
5) মদনমোহন রায় (প্রাক্তন উপ-প্রধান, চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েত) যিনি খননের পূর্বের দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং মৌখিক ঐতিহ্য নিয়ে বিস্তারিত লিখে পাঠান।
6) সেখ আমিরুদ্দিন, আমার বন্ধু, যে ক্ষেত্রসমীক্ষায় সঙ্গ দিয়েছিল।

চিত্র ঋণ:

1) মদনমোহন রায়
2) সেখ আমিরুদ্দিন
3) শ্যামসুন্দর বেরা

তথ্যসূত্র:

1) জানা, রঙ্গনকান্তি। (২০১৬), ‘স্থাপত্য ধারায় বর্ধমান জেলা’, ইতিকথা, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা, পৃ. ৪৯।
2) যশ, সর্বজিৎ। (৪ঠা মার্চ ২০১২), ‘বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে’, বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান, পৃ. ৫-৬।
3) Deshpande, M. N (Ed.). (1975, January 1). ‘Indian Archaeology, 1971-72: A Review’, Archaeological Survey of India, New Delhi.
4) Thapar, B.K (Ed.). (1978), ‘Indian Archaeology, 1973-74: A Review’, Archaeological Survey of India, New Delhi.
5) Thapar, B.K (Ed.). (1979), ‘Indian Archaeology, 1974-75: A Review’, Archaeological Survey of India, New Delhi.
6) Sen, Sailendra Nath. (1973), ‘A Note on the Excavated Buddhist Stupa at Bharatpur in Burdwan (West Bengal), in Proceding of the Indian History Vol I, Indian History Congress.
7) Jana, Rangankanti. (2011), ‘Tracing of the Archaeology of Buddhism in the Early Medieval Bardhaman, west bengal’ in Pratna Samiksha A Journal of Archaeology Vol2, Centre for Archaelogical Studies and Training, Eastern India, Kolkata.
8) জানা, রঙ্গনকান্তি। (২০১৬), ‘স্থাপত্য ধারায় বর্ধমান জেলা’, ইতিকথা, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি, কলকাতা।
9) যশ, সর্বজিৎ। (৪ মার্চ ২০১২), ‘বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে’, বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান।

10) Majumdar, R.C (ed.). (May 1943), 'The History of Bengal', Vol.1, Hindu Period, The University of Dacca, Dacca, পৃ. ২৬-২৭।
11) চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি। (২০০০), বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, পৃ. ৩।
12) তদেব।
13) তদেব।
14) দাঁ, সুধীরচন্দ্র। (১৯৯২), বর্ধমান পরিক্রমা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৫৬।
15) তদেব।
16) প্রাগুক্ত, A Note on the Excavated Buddhist Stupa at Bharatpur in Burdwan (West Bengal), পৃ. ৪১।
17) প্রাগুক্ত, Indian Archaeology, 1971-72: A Review, পৃ. ৫০।
18) তদেব।
19) প্রাগুক্ত, A Note on the Excavated Buddhist Stupa at Bharatpur in Burdwan (West Bengal), পৃ. ৪১।
20) প্রাগুক্ত, Indian Archaeology, 1973-74: A Review, পৃ. ৩৬-৩৭।
21) তদেব।
22) প্রাগুক্ত, Indian Archaeology 1973-74 A Review, পৃ. ৩৬-৩৭।
23) তদেব।
24) তদেব।
25) তদেব।
26) তদেব।
27) প্রাগুক্ত, Indian Archaeology 1974-75 A Review, পৃ. ৫১।
28) তদেব।
29) Singh, S. S. (2023, January 21). Of a bygone era: excavations reveal Buddhist monastery complex at Bharatpur of Bengal. The Hindu. https://www.thehindu.com/society/history-and-culture/excavations-reveal-buddhist-monastery-complex-at-bharatpur-in-wb/article66416717.ece
30) মুখোপাধ্যায়, অলখ (২০২৩, জানুয়ারি ৩০)। বিদ্যাচর্চার প্রাচীন কেন্দ্রের খোঁজ মিলল ভরতপুরে। anandabazar.com. https://www.anandabazar.com/west-bengal/the-ancient-center-of-learning-was-found-at-bharatpur-in-east-burdwan/cid/1403211
31) প্রাগুক্ত, বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে, পৃ. ৫-৬।
32) প্রাগুক্ত, বর্ধমান পরিক্রমা, পৃ. ১৫৮।
33) তদেব।
34) তদেব।

35) প্রাগুক্ত, A Note on the Excavated Buddhist Stupa at Bharatpur in Burdwan (West Bengal), পৃ. ৪৩।
36) তদেব।
37) প্রাগুক্ত, বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে, পৃ. ১০৬।
38) তদেব।
39) তদেব, পৃ. ১০৯।
40) তদেব।
41) Saraswati, S. K. (1976, January 1). Architecture of Bengal: Ancient phase. Calcutta : G. Bharadwaj. পৃ. ২৫।
42) প্রাগুক্ত, বর্ধমান পরিক্রমা, পৃ. ১৫৬।
43) তদেব।
44) তদেব।
45) প্রাগুক্ত, বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে, পৃ. ১০৯।
46) তদেব।
47) ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে উঠে আসা পর্যবেক্ষণ। ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিচালনা করেছেন সার্থক লাহা (গবেষক স্বয়ং) এবং সাহায্য করেছেন সেখ আমিরুদ্দিন (০৪.০৩.২০২৩ থেকে ০৭.০৩.২০২৩)।
48) পাল, রামপ্রসাদ: সাক্ষাৎকার, ভরতপুর, পূর্ব বর্ধমান, ৬ মার্চ, ২০২৩।
49) মেটে, কৈলাস: সাক্ষাৎকার, ভরতপুর, পূর্ব বর্ধমান, ৬ মার্চ, ২০২৩।
50) রুইদাস, বুদ্ধদেব: সাক্ষাৎকার, নস্করবাঁধ, পূর্ব বর্ধমান, ৬ মার্চ, কলকাতা।
51) রায়, মদন মোহন: সাক্ষাৎকার, মনোরমপুর, পূর্ব বর্ধমান, ২ এপ্রিল, ২০২৩।
52) প্রাগুক্ত, বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে, পৃ. ১১০।
53) চক্রবর্তী, সঞ্জীব (২০১৯, মে ১৩)। ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে বর্ধমানের পথে প্রান্তরে। Eisamay. https://eisamay.com/west-bengal-news/others/the-memory-of-lord-buddha-is-spread-in-the-wilderness-on-the-path-of-burdwan-sanjiv-chakraborty/articleshow/69292212.cms
54) প্রাগুক্ত, বর্ধমান জেলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সন্ধানে, পৃ. ১১০।
55) তদেব।
56) দত্ত, শ্রাবণী (২০১৯, জানুয়ারি ৮)। পশ্চিম বর্ধমানের বৌদ্ধ প্রত্নস্থল। anandabazar.com. https://www.anandabazar.com/editorial/buddhist-archaeological-site-at-paschim-bardhaman-1.929262
57) Singh, S. S. (2023, January 21). Of a bygone era: excavations reveal Buddhist monastery complex at Bharatpur of Bengal. The Hindu. https://www.thehindu.com/society/history-and-culture/excavations-reveal-buddhist-monastery-complex-at-bharatpur-in-wb/article66416717.ece